জনকণ্ঠ

শিক্ষা দিবস

বৈষম্যের অবসান চাই

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

শিক্ষা দিবসের ৪৪ বছর পূর্তিতে ঐ আন্দোলনেরই একজন সংগঠক ও কর্মী হিসেবে আমার কাছে এ কথা আজ স্পষ্ট যে, যে যে কারণে '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তার প্রায় সবই আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ফিরে এসেছে। কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখই তার জন্য যথেষ্ট। পাকিস্তানী স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের আশীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এসএম শরীফকে চেয়ারম্যান করে গঠিত কমিশনের রিপোর্টের সঙ্গে বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমে এক নজর তুলনাতেই তার পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সম্ভব। (এক) শিক্ষা সস্তায় পাওয়া সম্ভব নয়। পৃষ্ঠা-৩৯৬। (দুই) "শিল্পে মূলধন বিনিয়োগকে আমরা যে নজরে দেখি, অনেকটা সে নজরে শিক্ষা বাবদ অর্থ ব্যয়কে দেখার যৌক্তিকতা প্রতীয়মান হয়।" পৃষ্ঠা-৩৯৫। (তিন) "অবৈতনিক শিক্ষার ধারণা অবাস্তব কল্পনা মাত্র।" পৃষ্ঠা-৩৯৮। (চার) ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে ডিগ্রী পর্যন্ত ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক পাঠ হিসাবে শিক্ষা দিতে হবে।" পৃষ্ঠা-৩৪৯। এসবই শরীফ কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশ। এর সাথে বাংলাদেশের বর্তমান শাসকদের শিক্ষা ভাবনার, শিক্ষা কার্যক্রমের সাদৃশ্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

বৈষম্য, বঞ্চনা, পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সংঘটিত '৬২ শিক্ষা আন্দোলনের প্রধান প্রধান প্রত্যাশার বেশকিছু '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত হয়। যেমন ১৬ নম্বর ধারা–"নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে..." রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।" ১৭ নম্বর ধারা–"রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য... কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।" ১৯ নম্বর ধারা–১. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে। ২. মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানের ঐ সব ধারা বর্তমানে কতটুকু কার্যকর, তা বোঝার জন্য শিক্ষাবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাতকে উদ্ধৃত করা যায় : "১৪ কোটি মানুষের বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ১১ কোটি ৯০ লাখ মানুষ বঞ্চনা-লাঞ্ছনার ফাঁদে বিপন্ন; শিক্ষার নির্বিচার বাজারীকরণ ও বাজেটে শিক্ষার বরাদ্দ-ভাগ হ্রাস পেয়েছে।' এ বিপন্নতা রোধে একমুখী সর্বজনীন সৃজনশীল শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাষ্ট্রে বর্ধিত মনোযোগের বিকল্প নেই। জরুরী বিষয়ে অন্যতম হতে হ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ কমপক্ষে দ্বিগুণ বৃ করা।...স্বাক্ষর-নিরক্ষর মিলে প্রায় ৩ কোটি মানুষ (যাদে অধিকাংশই যুবক) এখনও বেকার। প্রায় আট কোটি মানুষ এখন কার্যত নিরক্ষর এবং প্রকৃত শিক্ষাসুযোগ বঞ্চিত। সারাদেশে প্রতিবছ ৬ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। এর অর্ধেকই পাঁচ বা তারও কম বয়সে শিশু। ৫০% ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ দারিদ্র্য। নিউমোনিয়ার চিকিৎসা মাথাপিছু ব্যয় প্রয়োজন মাত্র ১৩ টাকা, ডায়রিয়ার ১৭ টাকা, হামে ১২ টাকা এবং যক্ষ্মার ৯০০ টাকা। সে চিকিৎসাও ব্যাপক মানুষে জোটে না। প্রায় ১১ কো মানুষ এখনও বিদ্যুতসুবি বঞ্চিত। সীমিত আয়ে বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রকৃ অর্থেই দুর্দশাগ্রস্ত। বেকার এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতির স সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ে বলে সে দুর্দশাও বাড়ছে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে শিক্ষা উন্নয়ন বাজেট গত বছরে বাজেটের তুলনায় প্রায় ২৯ কোটি টাকা কমেছে। প্রাথমি ও গণশিক্ষার বাজেট কমে প্রায় ৪৮০ কোটি টাকা। দেশে ৮৭.৫% স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষা উপযোগী পাঠ উপকরণ নেই ৮১.৩% স্কুলে বৈজ্ঞানি যন্ত্রপাতি নেই। আ গবেষণাগার নেই ৯৪% স্কুলে ১৯৯০ সালে এইচএসসি বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষার্থী ছি মাত্র ২৪.৬৯%। ১৯৯৫ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৬.৬৯% স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ত ২৫% শিক্ষার্থী, এখন ৫%-এর নিচে।" (২১ এপ্রিল '০৫, জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতী শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় ড. আবু বারকাতের পঠিত প্রবন্ধ)। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিশেষ ক মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনগণের সন্তানরা বেসরকারী স্কুল কলেজে লেখাপড়া করে। কিন্তু সে সব প্রতিষ্ঠান ও সেখানে পা গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী, পাঠদানকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রতি বছরের পর বছর চলে আসছে সরকারের নিদারুণ অবহেলা অমানবিক বৈষম্য। দেশের ৫৩৩টি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ লা ৩৩ হাজার ৯৫০ এবং ২৪ হাজার ৪৯৬টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ কোটি ৯ লাখ ৭১ হাজার ৪১৬ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। সরকারী স্কুলছাত্রের জন্য মাথাপিছু সরকারের বার্ষিক ব্যয় ৩ হাজার ৩৫ টাকা। বেসরকারী স্কুলছাত্রের জন্য ৯৭২ টাকা। সরকারী কলেজছাত্রের জন্য ১৪ হাজার ৯৩৩ টাকা। বেসরকারী কলেজছাত্রের জন্য ১ হাজার ৬৮৯ টাকা। অন্যদিকে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীর সরকার থেকে ৯০ ভাগ বেতন পান এ কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে বল হলেও তা সত্য নয়; প্রকৃতপক্ষে তাঁরা পান বেতনের সূচনা-স্তরের ৯ ভাগ। নিচের ছক থেকে তার একটি ধারণা পাওয়া যাবে :

বৈষম্যের চিত্র

বেসরকারী শিক্ষক	সরকারী শিক্ষক
পিয়ন থেকে প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া ১০০ টাকা।	সর্বশেষ প্রাপ্ত জাতীয় বেতন স্কেলের (প্রবৃদ্ধিসহ) মূল বেতনের ৪০%/৫০%।
স্কেল অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ করা হয় না।	জাতীয় স্কেল অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ করা হয়।
চাকরির কোন নিশ্চয়তা নেই।	চাকরির পূর্ণ নিশ্চয়তা আছে।
কলেজ শিক্ষকদের সহকারী অধ্যাপকের উপরে সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপকের কোন পদ নেই। সহকারী অধ্যাপকের পদে পদোন্নতিও বন্ধ রয়েছে। ২৫ বছর ধরে ২ ও ৮ বছরে প্রাপ্ত উচ্চতর স্কেলও এ সরকার বন্ধ করে দিয়েছে।	সরকারী কলেজ শিক্ষকদের সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপকের পদ ছাড়াও প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ সিলেকশন গ্রেডে পদোন্নতি/উচ্চতর স্কেল পেয়ে থাকেন।
স্কুল শিক্ষকদের কোন পদোন্নতি নেই।	সরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে পদোন্নতি আছে।
প্রধান শিক্ষক (সমযোগ্যতা, সমঅভিজ্ঞতা সমদায়িত্ব পালন করে) এক ধাপ নিচের বেতন স্কেল পান।	সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ বেসরকারী প্রধান শিক্ষকদের তুলনায় এক ধাপ উপরের স্কেল পান।
প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি নেই।	সরকারী শিক্ষকগণ পরিপূর্ণ প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি সুবিধা ভোগ করেন।
উৎসব ভাতা বছরে এক-চতুর্থাংশ (অর্থাৎ জাতীয় বেতন স্কেলের ৯০ ভাগ বেতনের শিক্ষক ২৫% ও কর্মচারী ৫০%)।	বছরে ২টি পূর্ণাঙ্গ উৎসব ভাতা পান। এছাড়া প্রতি ৩ বছরে ১ মাসের মূল বেতনের সমান শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পান।
সরকারের অর্থে বেসরকারী শিক্ষকদের পেনশনের কোন ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি শিক্ষকদের নিজেদের অর্থে "অবসর সুবিধা" চালুর কথা বলা হলেও সে ক্ষেত্রেও নতুন করে বৈষম্য ও বঞ্চনার সৃষ্টি করা হয়েছে।	সরকারী শিক্ষকগণ পূর্ণাঙ্গ পেনশন সুবিধা ভোগ করে থাকেন।

'৬২ শিক্ষা আন্দোলনের গঠনাপত্তি ও ইতিহাস শিক্ষা দিবস উপলক্ষে আমার আগের লেখাগুলোতে বলেছি। আজ বলা প্রয়োজন : বৈষম্য বঞ্চনা নিরসনে পশ্চাৎপদতাকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সকল মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক মানুষের ঐক্যবদ্ধতা অপরিহার্য। খোলসে নয়, মূ সত্তায় স্বাধীনতার প্রত্যাশাগুলোর প্রতিষ্ঠা চাইলে, শিক্ষাকে ভিত্তি করে মানব তথা দেশ উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত হলে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত করার কোন বিকল্প নেই। যে অপশক্তি সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো ঘাড়ে চেপে বসেছে তাকে সরাতে হলে গোঁজামিল দিয়ে আপোসে কাজ হবে না। বিশিষ্ট ইংরেজ আইনবেত্তা টমাস হিল গ্রীন বলেছেন, স্বাধীনতা ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটোই হতে পারে কেউ পরাধীন না করলে, শৃঙ্খলিত না করলেও এক ধরনের স্বাধীনতা পাওয়া যায়, যা নেতিবাচক। আর আমাকে পরাধীন করার শক্তি সাহস ও স্পর্ধা কারও নেই–এ বিশ্বাসে বলীয়ান ব্যক্তি স্বশক্তিতে, স্বমহিমায় যে স্বাধীনতা ভোগ করে, তা-ই ইতিবাচক স্বাধীনতা বাংলাদেশের মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠী অবশ্যই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে, প্রগতির সপক্ষে, '৭১-এর স্বাধীনতার প্রধান প্রধান প্রত্যাশার অনুকূলে অবশ্যই সে স্বাধীনতার পতাকাকেই ঊর্ধে তুলে ধরবেন। তাই স্বাধীনতার খোলস নয়, প্রকৃত স্বাধীনত চাই–শিক্ষাক্ষেত্রে একটি মুক্তিযুদ্ধ চাই–তাই হোক এবারের শিক্ষা দিবসের মূল ধ্বনি।